# অন লাইন

এই কথাটা আগে আমি তেমন করে বুঝিনি। এখন খুব বুঝি। 'অন লাইন'।
এই যেমন 'অন লাইন ক্লাস'।
কি ভাবে হয় আমি দেখিনি। শুনেছি।
পড়ুয়ারা বাড়িতে বসে। যিনি পড়াচ্ছেন, শেখাচ্ছেন, তিনিও বাড়িতে বসে। পড়ানো হয়ে চলেছে। কেমন হচ্ছে তা বলতে পারবো না। তা নিয়ে বলার জন্য এই লেখাটিও নয়।

অন্য কথা কয়েকটি। বন্ধুদের বলা কথা।
এক বন্ধু অভিভাবক। কন্যার নাচ শেখার অন লাইন ক্লাস। ক্লাসের জন্য কিনতে হলো স্মার্ট ফোন। লাভ হলো স্মার্ট ফোন কোম্পানির আর অন লাইনের জন্য যারা 'লাইন' দেয় সেই সব কোম্পানির।
সমস্যা আমার। লাভ কোম্পানিদের। পুঁজি মালিকদের। পুঁজি সব সময় বাজার বানানোর জায়গা খোঁজে। জায়গা তৈরি করে। আমরা টের পাইনা।

আমার বন্ধু এক ধাপ এগিয়ে আর একটা কথা বললো। ছোটো মেয়েটির হাতে একবার স্মার্ট ফোন ধরিয়ে দিয়ে পরে আর ফেরত নেওয়া যাবে না। শৈশব আর কৈশোর স্মার্ট ফোনের মধ্যে দিয়ে আসা, স্মার্ট ফোনে ঢুকিয়ে দেওয়া জগতে চলে গেলো। সে জগৎটি কেমন তা নিয়ে কথা বলা এই লেখাটিতে নয়।

আমার বেশ কয়েকজন বন্ধু চিত্রকলার শিক্ষক। বাড়ি গিয়ে ছবি আঁকা শেখায়। সেটাই তাদের আয়। অনেকে আছেন যাঁদের স্মার্ট ফোন নেই, স্মার্ট ফোনের মধ্যে দিয়ে চিত্রশিক্ষা জানা নেই। তাদের শিক্ষকতা নাকচ, মাইনে বন্ধ। জীবনযাপন অসম্ভবে পৌঁছে গেছে।

চিত্রকলার শিক্ষকরা বাড়ি গিয়ে শেখাতে রাজি আছে। করোনা সাবধানতার নিয়ম কানুন মেনে নিয়ে। অভিভাবকরা রাজি নন। করোনা আতঙ্ক। অভিভাবকরা 'না' করেছেন, অথচ তাঁরাই শিক্ষকদের মাইনে দিচ্ছেন না। আর চিত্রকলা শিক্ষকরা তো ইউনিয়ন বানায়নি। বানাতে চায় বলে জানিও না। থাকলে ইউনিয়ন দাবি করতে পারতো সবেতন ছুটি। আমি যে নিজে থেকে কাজে যাচ্ছি না তাতো নয়, আমাকে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। যাদের কাছে কাজ করতে যাওয়া, তারা যেতে দিচ্ছে না, দায়টা তাহলে তাদেরই। অথচ দায়টা বইতে হচ্ছে শিক্ষকদের।

ইউনিয়ন একটা 'খারাপ' কাজ নয়। নিছক একটা রাজনীতিক বিষয় নয়। ইউনিয়ন একসাথে হওয়া,ভাবা, থাকা, কাজ করা, দলবদ্ধতা।

এমনটি শুধু ছবি আঁকা শেখানোতে নয়, লেখাপড়ার সব জায়গাতেই।

শিক্ষকদের যেমন বাতিল করা, তেমনি ছাত্রছাত্রীরাও বাতিল হয়ে যাচ্ছে। যে সমস্ত পড়ুয়ার স্মার্ট ফোন নেই, তারা শেখাতেও নেই। শ্রেণী বিভাজন।

পড়ুয়ারা পড়ার, শেখার জায়গায় যাচ্ছে না, একজনের সাথে অন্যজনের দেখা হচ্ছে না। একসাথে হওয়া হচ্ছে না। এইভাবে একদিন পড়ুয়ারা দল বেঁধে কিছু করা ভুলে যাবে। ছাত্র সমাজ, ছাত্রী ইউনিয়ন তৈরি হওয়ার জমি থাকবে না।

'অন-লাইন'-এ ক্লাস নেওয়া হচ্ছে। শিক্ষিকা-শিক্ষকরা স্কুল কলেজে যাচ্ছেনা। একসাথে হচ্ছে না। শিক্ষকরা দলবেঁধে কিছু করা ভুলে যাবে। শিক্ষক সমাজ, শিক্ষিকা ইউনিয়ন তৈরি হওয়ার জমি থাকবে না।

একজন অভিভাবকের সঙ্গে আরেকজনের দেখা হচ্ছে না। দলবেঁধে লেখাপড়া নিয়ে, শিক্ষা নিয়ে, ইস্কুল নিয়ে কথা বলা হচ্ছে না। অভিভাবক সমাজ, অভিভাবক ইউনিয়ন তৈরি হওয়ার ভূমি থাকবে না।

এবং এখন যখন 'শিক্ষা' আস্তে আস্তে অন্য সব প্রতিষ্ঠানের মতো সরকার থেকে বেসরকারে চলে যাচ্ছে, তখন এমন অবস্থায় লাভ শিক্ষা পুঁজির, পুঁজির।

অন্য একটা দিক দিয়ে ভাবি। পড়ুয়াদের সাথে পড়ুয়াদের, শিক্ষকদের সাথে শিক্ষকদের দেখা হওয়া নেই। তেমনি শিক্ষকদের সাথে ছাত্রদের দেখা হওয়া নেই। ছাত্র শিক্ষকের পড়ানোর বাইরে ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত বিষয়ে কথা বলা হবে না। শিক্ষকদের একটা বড়ো ভূমিকা বন্ধ হয়ে যাবে। শিক্ষক যখন ছাত্রকে বইয়ের, পড়ার বইয়ের বাইরে, নানা বিষয়ে অনুপ্রাণিত করে, আগ্রহী করে, সেখানে শিক্ষকের শারীরিক উপস্থিতি লাগে। একজন শিক্ষক ছাত্রকে, ছাত্রদেরকে সাংস্কৃতিক বিষয়ে, সামাজিক বিষয়ে, রাজনীতিক বিষয়ে উৎসাহী করে তোলে। তেমনটি আর হবে না। আমার যেটুকু রাজনীতি করা, তার শুরু ইস্কুলে ক্লাস টেন-এ পড়ার সময় এক বামপন্থী শিক্ষকের হাত ধরে।

আমরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, তখন একটা শিক্ষা বিষয়ক কমিশনের রিপোর্ট তৈরি হয়েছিল। যতদূর মনে পড়ছে 'মেহরোত্রা কমিশন'। বয়সের কারণে স্মৃতি দুর্বল। বোধহয় ১৯৯০ দশকে। তখন ভারত সরকারের 'নিউ ইকনমিক পলিসি' শ্যাম পিত্রোদার 'নিউ টেকনোলজি পলিসি'র সাথে মিলিয়ে 'নিউ এডুকেশন পলিসি'।

তখন যারা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শাসক বিরোধী শিক্ষক আন্দোলনের সামনের সারিতে, তাঁদের দুজনের সাথে কথা বললাম। বয়সে আমার থেকে বড়ো, ফলে মনে রাখায় সমস্যা। যেটুকু হাতড়ে হাতড়ে মনে করতে পারছিলাম তাতে সেই রিপোর্টটাতেই ক্লাস নেওয়ায় প্রযুক্তি ব্যবহারের কথাটা এসেছিল বলে মনে হচ্ছে।

আমরা, যে শিক্ষকরা সরকার বিরোধী, তারা প্রতিবাদ করেছিলাম। আমাদের মনে হয়েছিল ক্লাসঘর থেকে শিক্ষকদের, ছাত্রদের কাছ থেকে শিক্ষকদের সরিয়ে দেওয়া একটি রাজনীতিক প্রকল্প। এবং প্রযুক্তি-পুঁজির প্রকল্প, আর্থনীতিক প্রকল্প।

একটা প্রযুক্তির কথা এখন মনে পড়ছে। 'পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন'। ক্লাসে পড়ানোর সময়, সেমিনারে বলার সময়, মুখে ব্যাখ্যা না করে পর্দায় মোদ্দা কথাগুলো টাইপ করে দেখিয়ে দেওয়া, আর পড়ে দেওয়া।

'কথা টাইপ করে লিখে পর্দায় ফেলে দেখিয়ে দেওয়া' আর 'কথা মুখে বলা' দুটোর মধ্যে দর্শনগত ফারাক আছে, সেটা তখনই ধরতে পেরেছিলাম।

এভাবে যে একদিন শিক্ষককে ছাত্রদের সামনে না রেখে পড়াশোনা চালিয়ে নেওয়া যেতে পারে, তেমন সম্ভাবনাটির কথা তখন মাথায় এসেছিল। এখন তা সত্যি।

আর এখন তো আমার প্রগতিশীল বন্ধুরা আমাকে আলোচনায় ডাকছে কোথাও না গিয়ে ঘরে বসেই কাউকে সামনে না রেখেও 'বক্তৃতা' দিতে। তার জন্য কেউ চাইছে আমি 'জুম' প্রযুক্তি ব্যবহার করি, কেউ বলছে আলোচনার কথা আর আমার ছবি 'ভিডিও'তে তুলে শুনিয়ে, দেখিয়ে দিতে। আমি কথা বলে যাবো, যারা শুনছেন তারা আমার সামনে নেই, তাদের মুখ দেখতে পাবো না। দর্শক শ্রোতাদের থেকে আলাদা হয়ে আমি একা।

দল বেঁধে সভা  বানিয়ে কথা বলা, কথা শোনা, প্রশ্ন কথা, উত্তর কথা, মুখ দেখা, শরীর দিয়ে কথা বলা, বলা কথা শ্রোতাদের মনে আর শরীরে ছাপ ফেলছে কিনা চোখের সামনে দেখতে পাওয়া, দেখলে বিষয় আর ধরণ চালিয়ে নিয়ে যাওয়া অথবা বদলে ফেলা – এ তো এক অনন্তর কাজ।  ঘরে বসে অন লাইন-এ কি ভাবে হবে এসব?

এখন মিটিং ডাকা অন লাইনে, পোস্টার অন লাইনে বানানো, গণসংগীত অন লাইনে গাওয়া, শ্লোগান অন লাইনে দেওয়া, দেওয়াল লেখা অন লাইনে দেখানো, এখন বক্তৃতা অন লাইনে। সবটাই পুঁজির প্রযুক্তির আওতায়।

দল বেঁধে কাজ করায়, দল বেঁধে কাজে থাকায়, 'দল' তৈরি হতো, রাজনীতিকতায় থাকা হতো।

বাকি রইলো অবস্থান, ঘেরাও, মিছিল, অবরোধ, স্ট্রাইক যা রাস্তাতে, রাস্তার বিষয়, যেখানে রাস্তায় থাকাদের সঙ্গে ক্ষমতায় থাকাদের মোকাবেলা। বাকি সব রাস্তা থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে অনলাইনে।

একসময় অফিসে, কমপিউটার বসানো নিয়ে আন্দোলনে ছিলাম। গালমন্দ খেয়েছিলাম প্রগতিবাদীদের কাছে। এখন অন লাইনে ইলেক্ট্রিক আর টেলিফোন বিল জমা দিই, ব্যাঙ্কের কাজ করি। খেয়াল করিনা বিল জমা দেওয়ার জানালার ওপারে যারা বসে থাকতেন সেই কর্মীরা ছাঁটাই, ব্যাঙ্কের কাউন্টারের ভিতরে, টেবিলের ওপারে চেয়ারে যতজন ছিলেন তারা কমে গেছেন। তখন এই কথাটাই বলতে চেয়েছিলাম, প্রগতিবাদীরা বুঝিয়েছিলেন অর্থনীতির অগ্রগতিতে কাজ এক জায়গা থেকে সরে আরেক জায়গায় তৈরি হবে। হলো কি?

এখন তো অন লাইনে কাজ। তরুণ কর্মচারীরা 'ওয়ার্ক ফ্রম হোম' করছেন। ২৪টি ঘন্টা মালিকের হাতে তুলে দিয়ে। একজনের কাছে শুনলাম, মালিক/কোম্পানী বাড়িতে সকাল ৮টা থেকে কাজ শুরু করে দিচ্ছে, কেন? কারণ অফিসে আসার জন্য তো সকাল ৮টায় বাড়ি থেকে বেরতে হতো, তাই।

একজন কর্মীর সাথে আরেকজন কর্মীর দেখা হয় না, হবে না। 'কর্মচারি ইউনিয়ন', 'ট্রেড ইউনিয়ন' বলে একটা বিষয় ছিল। পুঁজির প্রযুক্তি 'অন লাইন' দিয়ে শ্রমের রাজনৈতিক ক্ষমতা মুছে দিয়ে পুঁজির ক্ষমতাই বসিয়ে দিল।

আমরা এখন এসব নিয়ে ভাবি না। রোজ ভোর থেকে অন লাইন যা ভাবায়, অন লাইনে যা ভাবনা আসে, তাই নিয়েই আমাদের সারা দিনের ভাবনা। হোয়াটস্ অ্যাপ, ফেসবুক, টুইটার, ইন্সটাগ্রাম, পোস্টিং, ফরোয়ার্ড, সেন্ড, লাইক, গেম, সার্চ নিয়ে আমাদের ব্যস্ত থাকা। চটজলদি লেখো, চটজলদি পাঠাও, জলদি পড়ো, জলদি ভাবো, চট করে মত দাও।

বড়ো লেখার, লেখা পড়ার অভ্যেস কমে যাচ্ছে। বড়ো লেখার বিষয় নিয়ে ভাবার অভ্যেস কমে যাচ্ছে।

ভাবনা কমে গেলে পুঁজির বেজায় লাভ, রাজনৈতিক লাভ।

আর যারা 'অন লাইন'-এ আসতে পারছে না, সমাজের, অর্থনীতির, সংস্কৃতির, রাজনীতির নীচের দিকে রেখে দেওয়া মানুষজন, তাদেরকে সব কিছু থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হলো। লেখা, পড়া, দেখা, শোনা, ভাবনা, জড়ো হওয়া, আন্দোলন, সব কিছু থেকে।

হয়তো ভালই হলো।

উপর থেকে আসা ভাবনা, লেখা, কথা, কাজ না এলে তারা নিচের দিকে নিজেরাই নিজেদের মতন করে, নিজেদের দেখা, শোনা, ভাবা নিয়ে নিজেদের জন্য ভাবনা, কাজ, কথা, সংস্কৃতি, রাজনীতি বানাতে পারবে।

এই বিশ্বাসটাই এমন সব হারানোর সময়ে একটা 'পাওয়া' হয়ে থাকুক।

শুভেন্দু দাশগুপ্ত
কলকাতা, অগাস্ট ৫, ২০২০

যোগাযোগ : 9831172060
nagarikmancha@gmail.com